আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা (১৯৮০)

পূর্ণেন্দু পত্রী

অনেক বছর পরে

অনেক বছর পরে তোর কাছে এসেছি, মল্লিকা!
বহুদিন আপিসের কাজে-কম্মে ডুবুরির মতো
বহুদি মেশিনের যন্ত্রপাতি হয়ে
বহুদিন বাবুদের গাড়ির টায়ার হয়ে সুদুরে ছিলাম।

তোর পাশে চাঁপা ছিল, টগর, ঝুমকো-জবা ছিল।
তারা কই ? মারা গেছে ? সে কি ? কবে ? সাতাত্তর সালে ?
এত মৃত্যু ঘটে গেল একাত্তর বাহাত্তর তিয়ত্তর সালে
এত হত্যা ঘটে গেল চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সালে।
আজ আর ধ্বংস, হত্যা, মৃত্যু কারো হৃদয়ের ভুমিকম্প নয়।
মল্লিকা ! দুঃখের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা বল।
মল্লিকা ! নিজের স্বপ্ন-শরীরের গল্প-টল্প বল।
চাঁদের আলোর নিচে আমাদের আশাতীত খেলাঘর ছিল
সেই বাল্যকাল, সেই হরিণশিশুর কথা বল।

বহুদিন বাবুদের বাগানবাড়ির মালী হয়ে
বহুদিন বৃক্ষহীন দ্বীপান্তরে বেহুঁশ ছিলাম।
মল্লিকা ! বুকের দুধে বহু যত্নে যাকে পুষেছিলি
কই সে কিন্নরকণ্ঠী খঞ্জনীটা ? সে আসে না কেন?
মারা গেছে ? সে কি? কবে ? সাতাত্তর সালে?
এত মৃত্যু ঘটে গেল একাত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে
এত হত্যা ঘটে গেল চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সালে।

বৃহৎ আকাশ তবু রাজছত্র ধরে আছে মানুষের মাথার উপর।

অলৌকিক

অলৌকিক এইভাবে ঘটে।
হঠাৎ একদিন ফাঁক হয়ে যায় সাদাসিধে ঝিনুক,
ভিতর থেকে ঠিকরে বেরোয় সাদা জ্যোৎস্না।

সেদিন মুক্তোর মতো গড়িয়ে এলে আমার হাতে।
অমনি বদলে গেল দৃশ্য।
আমার ডান দিকে ছিল মেঘলা দিন
হয়ে গেল ডালিম-ফাটানো রোদ।
আর বাঁদিকে ছিল ইটের পাঁজা
হয়ে গেল লাল টালির ডাকবাংলো।

অলৌকিক এইভাবে ঘটে।

আগুনের খোলা ঝাঁপি

সময় প্রতিমা!
আগুনের ঝাঁপি খুলে দিলাম তোমাকে,
আত্মসমর্পণে আমি সম্মত হলাম।

ক্ষৌরকার ডেকে এনে কাল-পরশু মাথা ন্যড়া হবো
রাজার পোষাক ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবো গঙ্গাজলে।
গায়ে বড় আঁট হয়ে, বাঁশের গাঁটের মতো খোঁচা হয়ে আছে যে সকল
স্বর্ণ বর্ণ- অলঙ্কার, লকেট, মেডেল
সেই সব মণি-মুক্তো বেনাবনে শুকোবে এখন

দেবদারু গাছগুলি তদোর দুঃখের সব গোপনীয় কথা শুধু আমাকেই বলে
ক্ষুধিত বেড়ালে নখে চিরেছে যে সব ডালপালা
তার সব আর্তনাদ আমার ঘুমের মধ্যে হাতুড়ি পেটায় ঝন্‌ঝন্ ।
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাই
সমুদ্রের ঢেউগুলি দরজার কাছাকাছি এসেছে কখন,
তখন মেঘের পাখি ভোরবেলার আলতা রং মেখে
শিয়রের কাছে বসে কথা বলে আত্মীয়ের মতো।
নোংরা জল ঢুকে ঢুকে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে সব পৃথিবীর খনিগর্ভগুলি
এই রকম অতর্কিত শিরোনাম ফুটে ওঠে জানালায় গায়ের আকাশে।

সময় প্রতিমা!
আকাঙ্খার ঝাঁপি খুলে দিলাম তোমাকে।
আত্মসমর্পনে আমি সম্মত হলাম।

তুমি যদি যুদ্ধে যাও, আমার সমস্ত সৈন্য পাবে।
রেলকলোনীর মাঠে তুমি যদি জনসভা ডাকো
হিম হাওয়া, অন্ধকার, কাঁটাতার, রক্ত-হাসি ঠেলে
প্রত্যেকটি ব্যথিত গাছে আলোর লন্ঠন আমি টাঙাবো একাই
তোমার তুনীর আমি ভরে দেবো, বিজয় উৎসবে।

আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা

আমরা যারা চল্লিশের চৌকাঠ পেরিয়ে পঞ্চাশের দিকে
সেদিন আঠারো বছরের উথাল-পাথাল বাউণ্ডলে সেজে
সারারাত তুমুল হৈ-হল্লা।
আগুনের পিন্ডি গিলে গিলে, আগুনের পিন্ডি গিলে গিলে
প্রত্যেকে এক-একজন তালেবর।
‘বুঝেছি, পৃথিবীটাকে উচ্ছন্নে পাঠাবে ছোঁড়াগুলো ।
নিজের মনে গজ গজ জানলা খুলে পালিয়ে গেল হাওয়া।
‘বুঝেছি, একটা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী না ঘটিয়ে এরা ছাড়বে না।
ভয়ে এক ঝটকায় নিভে গেল সমস্ত টিউব লাইট।
আমাদের উড়ো চুলগুলো তখন মনুমেন্ট-মুখো মিছিলের পতাকা
আমাদের শরীরের খাঁজে খাঁজে তখন বিরজু মহারাজের কথক
গলায় আমীর খাঁকে বসিয়ে কোরাস ধরেছি
-জগতে আনন্দ যজ্ঞে

গান থামতেই, যেন রেডিওতে শোকসংবাদ, এমনি গলায়
শান্তি বলে উঠল-

‘জানিস, আর মাত্র কুড়ি বছর পরে খতম হয়ে যাচ্ছে
পৃথিবীর সমস্ত পেট্রোল আর তারপরেই কয়লা-,
অমনি মরা আগুনে ঘি পড়ার মতো দাউ দাউ
আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা।
শান্তি থামতেই নীলামদারের মতো হাঁক পাড়ল সুনীল-
‘মেরামতের অযোগ্য এই পৃথিবীটার অন্যে আমি কিনতে চাই
একটা ব্রহ্মাণ্ডজোড়া ডাস্টবিন।
অমনি একশোটা ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ্উল্লাসে
আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা।
তার পরই রক্তাক্ত যীশুর ভঙ্গীতে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়াল পৃথীশ।
‘বন্ধুগণ!
যে-যার হাফ প্যান্টগুলো কাচিয়ে রাখুন
খোঁড়া তৈমুর আবার জেগে উঠছে কবর ফুঁড়ে
গেরিলা যুদ্ধের সময় দারুণ কাজে লাগবে।
অমনি আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা
মিলিটারি ব্যান্ডের মতো ঝমঝমিয়ে।

হিমালয় থেকে গড়াতে গড়াতে
প্রকণ্ড বোল্ডারের মতো জেগে উঠল শক্তি।

‘এবার আমি কিছু বলতে চাই।
গাছ এবং পাথর এমনকি ফুলের ছেঁড়া পাপড়ির সম্বন্ধে
সাংঘাতিক কিছু কথাবার্তা জেনে গেছি আমি,
বুড়ো শালিকগুলোর ঘাড়ের রোঁয়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে
এখন আকুপাংচারের মতো ঢুকিয়ে দিতে হবে সেগুলো।’

অমনি শান্তির গলা জড়িয়ে আমি
আমার কোমর জড়িয়ে সুনীল
সুনীলের পায়ের তলায় পৃথীশ
পৃথীশের পাকস্থলীতে শক্তি
শক্তির নাইকুণ্ডলীতে সুনীল, সুনীলের জুলফিতে আমি
আমার ঊরু কিংবা ভুরুতে শান্তি
এইভাবে দলা পাকাতে পাকাতে
আমাদের তুমুল হৈ-হল্লার রাতটাকে
নদীনালার দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
কলকাতার অন্ধকুপের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
কী যে দুর্দান্ত কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছি, কিচ্ছু মনে নেই।

আসুন, ভাজা মৌরী খাই

দেখুন, দেখুন, প্রজাপতিগুলো
এবেলা-ওবেলা ঝুলতে ঝুলতে কেমন বাদুড়
আর গুয়োপোকাগুলোর কেমন বাঁই বাঁই উড়োজাহাজে পিঠ এলিয়ে
আর ঘরবাড়িগুলো
কী বিশ্রী রকম কোৎ পেড়ে চলেছে প্রসব-যন্ত্রণায়।
আসুন এই ফাঁকে আমরা একমুঠো ভাজা মৌরী খাই
আর টুথ পিকে দাঁতের মাংস খুঁটি।

দেখুন দেখুন, লম্বা মানুষগুলো
কেমন বেঁটে হয়ে যাচ্ছে গায়ে নামাবলী জড়িয়ে

আর শক্ত দেয়ালগুলো
কেমন কুজো হয়ে পড়েছে প্রতিশ্রুতির বড় হরফের ভারে
আর আবহাওয়ার তলপেটে
কেমন গোঁ গোঁ করছে নতুন বিপদ-আপদ।
আসুন এই ফাঁকে আমরা একুমঠো ভাজা মৌরী খাই
আর টুথ পিকে দাঁতের মাংস খুঁটি।

দেখুন দেখুন, ঝড় নেই
তবু ভেঙে পড়ছে ইস্পাতের পঞ্চবার্ষিকী কাঠামো।
ভেঙে পড়ছে মুখোশের হাড়গোড় এবং বক্তৃতামঞ্চ।
আর ঝড়ের পাখিগুলো।
নতুন গ্রামোফোনে গেয়ে চলেছে পুরনো কাওয়ালি।
আসুন এই ফাঁকে আমরা একমুঠো ভাজা মৌরী খাই
আর টুথ পিকে দাঁতের মাংস খুঁটি।

একি অমঙ্গল

তোমার হাতে ছুঁচ-সুতোটি
আমার হাতে ফুল
দেখতে পেয়েই আকাশ জুড়ে হিংসা হুলুস্থুল।
তোমার হাতে রঙের বাটি
আমার হাতে তুলি
দেখতে পেয়েই শুকনো মড়া চোখে জ্বালায় চুলি।

তোমার হাতে ধান-দুর্বো
আমার হাতে শাঁখ
দেখতে পেয়েই আকাশ চিরে শকুন পাড়ে হাঁক।
তোমার হাতে জলের ঘাট
আমার ঠোঁটে জল
দেখতে পেয়েই দৈববাণী: এ কি অমঙ্গল!

গভীর ফাটল তবু

বনে ও জঙ্গলে রোদ ছায়া গুলে আলপনা আঁকে
আকাশের আশীবাদ তৃণ শস্য সারা গায়ে মাখে
গভীর ফাটল তবু পৃথিবীর মাঠে পড়ে থাকে।

মেঘ নামে, বৃষ্টি পড়ে, বীজেরা ভুমিষ্ট হতে থাকে
যুবতীর ভঙ্গিমায় তরুলতা দিনে দিনে পাকে
গভীর ফাটল তবু পৃথিবীর মাঠে পড়ে থাকে।

মানুষের ঘুম ভাঙে বনবাসী পাখিদের ডাকে
আকাঙ্খাকে কাঁধে নিয়ে হেঁেট যায় সাঁকো পার হয়ে দূর বাঁকে
গভীর ফাটল তবু পৃথিবীর মাঠে পড়ে থাকে।

গাছপালাগুলো

গাছপালাগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল।
কেউ কেউ স্নান করেনি কতদিন
কেউ কেউ চুল কাটেনি কতদিন
কেউ কেউ বাসি জামাকাপড় পরে আছে কতদিন।

মনে হয় মাঝরাতে ঘুসঘুসে জ্বর হয় কারো কারো
কারো কারো হাঁপানির শ্বাসকষ্ট শুনতে পাই মাঝরাতে
স্বপ্নের মধ্যে এপাশ-ওপাশ আইঢাই করে কেউ কেউ।
কেউ কেউ নিশ্বাস ফেলে আগুনে হাপরের মতো।

গাছপালাগুলো সত্যি সত্যি কেমন হয়ে গেছে আজকাল।
একটু সব্য-ভব্য হ।
বাইরে যখন ঝড়-ঝাপটার ওলোট-পালোট হাওয়া
ঘরে শুয়ে বসে থাক দুদণ্ড।
দেখছিস তো দিনকাল খারাপ
মেঘে মেঘে দলা পাকাচ্ছে গোপন ফিসফাস
দেখছিস তো ইট চাপা পড়ে ঘাসের রঙ হলুদ।
দেখছিস তো যে-পাখি উড়তে চায় তার ডানায় রক্ত।
একটু সাবধান সতর্ক হ।
সে-সব কথা কানে ঢোকে নাকি বাবুদের?
উড়নচন্ডের মতো কেবল ঘুরছে আর পুড়ছে,
যেন এক একটি বদরাগী বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র।
এক-একদিন না চেঁচিয়ে পারি না।
-ও হতভাগারা! যাচ্ছিস কোন চুলোয়?

-ভাঙতে।
-কী?
-সেই সব থাম, যাদের গায়ে সাত শতাব্দীর ফাটল।
-তারপর?
-সেই সব পাথর, যাদের দেবতা সাজিয়ে আরতি হচ্ছে ভুল মন্ত্রে।
-তারপর?
-সেই সব তালা, যার ভিতরে ডাঁই হয়ে আছে যুগ যুগান্তের লুটের মাল।
-তাহলে ফুল ফোটাবি কবে?
-আগে আগে- গা লাগিয়ে অরণ্যহই
পরাস্ত অন্ধকারের কবর খুঁড়ি এঁদো জঙ্গলে
তারপর ডালপালা ঝাঁপিয়ে ফুল
ফুলের মশাল জ্বালিয়ে আহলাদে আটখানা হৈ হৈ উৎসব।
-তবে মরগে যা! মরে আকাশ পিদিম হ।
এই বলে আমি খিল তুলে দিই আমার খিড়কি দরজায়।

চেনা যায়

অন্ধকার ছিলে বুঝি?
গাছের আড়ালে ছিলে, গর্তে ছিলে
ভিজে খড়ে জড়াজড়ি ছিলে?
মাথাভর্তি লণ্ডভণ্ড চুল।
সারা গায়ে রক্তের আঁকচারা।
যুদ্ধে ছিলে, সেনাপতি ছিলে?

এখনও তোমার চোখে আগুনের ছাই
প্রকাণ্ড কপাল জুড়ে থাকে থাকে
গুপ্ত অস্ত্রাগার।
বহুদিন পরে দেখা
তবুও তোমাকে ঠিক অভিমন্য বলে
চেনা যায়।

তোমার জন্যে, ও আমার প্রিয়া

(জ্যাক প্রেভেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে)

আমি গেলাম পাখির বাজারে
তোমার জন্যে পাখি কিনতে
ও আমার প্রিয়া।
পাখির বাজারে পাখি নেই।
খিক খিক করছে লোহা-লক্কড়ের খাঁচা
আর সরু মোটা শিকলি
আর সেই সব দাঁড়িপাল্লা যাতে রক্ত ওজন হয়
সেরা জাতের পাখিদের সবুজ হৃৎপিণ্ড।

আমি গেলাম ফুলের বাজারে
তোমার জন্যে ফুল কিনতে
ও আমার প্রিয়া।
ফুলের বাজারে ফুল নেই।
খিক খিক করছে নীল মাছি হলুদ ডানা
আর চিমসে পোকামাকড়

আর বেশ্যার দালারদের সেই সব ফলন্ত মগজ
রাংতাকে সোনার দামে বেচতে বেচতে
যারা লাট-বেলাট।

আমি গেলাম গয়নার বাজারে
তোমার জন্যে গয়না কিনতে
ও আমার প্রিয়া।
গয়নার বাজারে গয়না নেই।
গিজ্ গিজ্ করছে লম্বা ঠ্যাঙের কাঁটা কম্পাস
আর খরখরে দাঁতের করাত
কুড়োল, কাটারি, কর্নিক।
আর পরোপকারী সেই সব তুখোড় কম্পিউটার
যারা এক নিশ্বাসে বলে দিতে পারে
পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্তহত্যা অথবা ষড়যন্ত্রকে
কত দিয়ে ভাগ
অথবা কি কি দিয়ে গুণ করলে
ফলাফল হবে অমায়িক একটা মুখোশ।

আমি গেলাম বইয়ের বাজারে
তোমার জন্যে বই কিনতে
ও আমার পিয়া।
বইয়ের বাজারে বই নেই।
ঝলমল করছে শাড়ি শায়া ব্লাউজ সেন্ট সাবান
আর কত রকমের চিকন লেস
আর সেই সব অলৌকিক রুমাল
যাদের বশীকরণ মন্ত্রে

খুন-জখমের রক্ত-ছাপ অন্ধকারকেও মনে হয়
পরমাশ্চর্য ঘুম।

দীপেন বললেই

দীপেন বললেই
একটা প্রকাণ্ড গাছ
ঝড়াকে যার থোড়াই কেয়ার।
একটা চওড়া বাধ
য়ার কাছে নতজানু
সমস্ত প্লাবনের জল।

কি চমৎকার আগুন নিয়ে খেলা করতো
দীপেন
পুড়তো না কিছু
শুধু জলজল করে উঠতো
চারপাশের নুড়ি, পাথর, ধুলোবালি।

কী চমৎকার বাঁশী বাজাতো
দীপেন
সাপের ফণাগুলো
মুখোশ খুলে ছুটে আসতো
আলিঙ্গনের লতাপল্লবে।

দীপেন বললেই
লক্ষ্ণৌ এর বাদশাহী রাত,

আমাদের আদি যৌবনের
তুলকালাম দাপাদাপি।
আবার
গানের কলির অলিতে গলিতে
কাকে খুঁজে বেড়ানো।

দীপেন বললেই
ময়দানের ঘাসে
হাজার পতাকার হৈ হৈ হাসি
শুকনো মুখের কুলঙ্গীতে
সার সার প্রদীপ।

দীপেনকে
সব গোপন কথা বলতে পারি আমি।
দীপেনকে
ছুরির ফলায় টুকরো করতে পারি আমি।
বাতিল কাগজের মতো দলা পাকাতে পারি আমি।
দীপেন শুধু বলবে
আয়! বোস হতভাগা
মুখে জয়জয়ন্তী হাসি।

দীপেন
আমি তোর শোকসভায় গিয়েছিলাম।
তুই লম্বা হতে হতে
ভালোবাসার আলোয় ভোরের মতো

রাঙা হতে হতে
ফুলের মালায়
ক্লান্ত হতে হতে
কোথায় যেন চলে যাচ্ছিস।
কোথায়?
তুই বললি
বোস্ হতভাগা। আসছি।

দু-পাল্লা জানালা

দু-পাল্লা জানালা কেউ পেয়ে যায় মর্মের ভিতরে
দৈববাণী আসে সেই পথে।

তোমরা বিদীর্ণ হও, যারা গাও নক্ষত্রের স্তব
তোমরা রক্তাক্ত হও, যারা চাও দুষপ্রাপ্য লন্ঠন
তোমরা একাকী হও, যারা খোঁজো মানুষের মুখে
মহাবল্লীপুরমের স্তম্ভের মতন কারুকাজ।
ভিজে তোয়ারের মতো নিজেকে নিংড়িয়ে শুকনো করো
চিরতৃণ হয়ে ফোটো শ্মশানের কাঠ-কয়লা চিরে।
ভিখারীর প্রিয়তম আধুলির মতো যোগ্য হও
পৃথিবীর ভাঙাচোরা অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে।

দু-পাল্লা জানালা কেউ পেয়ে যায় মর্মের ভিতরে
ঈশ্বর সেখানে এসে এইভাবে কথা বলে যান।

দুঃখ দিয়েছিলে তুমি

দুঃখ দিয়েছিলে তুমি
আবার লাইটারও দিয়েছিলে।
বোতাম ছিড়ে আমাকে লগ্ন করেছো তুমি
আবারবুনে দিয়েছো নাইলনের সবুজ জামা।
কমলালেবু নিংড়ে নিংড়ে বানানো সরবৎ
ভিতরে মিশিয়ে দিলে গোপন কান্নাকাটি
স্মৃতির পেস্তা-বাদাম
সেই সরবৎ খেতে হবে এখন প্রত্যহ
বাইশ বছরের যুবকটা যতদিন আমার
চুলের ভিতরে আঁচড়াবে
আগুন রঙের চিরুনি।

দৈববাণী

বৃক্ষ হবো
চারপাশে আলোকিত জলের বাঁক
জলের গভীরে নারীর সাজবদলের মতো দৃশ্য
দৃশ্যের গভীরে সুগম্ভীর ঘন্টাধ্বনি
মাতৃজঠর থেকে আমরা শুনে আসছি এই সব দৈববাণী।
ব্রাহ্ম মুহূর্তের রাঙা আবীরের মতো আমাদের ভ্রমণ হবে ভূ-পৃষ্ঠময়

ঋষিকুমারের মতো আমরা খচিত হবো দুর্লভ প্রবালে
নানা রকমের লাল দেয়ালে কালো অক্ষরে
নানা রকমের কালো দেয়ালে লাল অক্ষরে
নানা রকমের গাঢ় এবং ফিকে পতাকার মিছিলে, দুন্দুভিতে
মাতৃজঠর থেকে শুনে আসছি দৈববাণী।

আহলাদে লাফিয়ে উঠেছে দুশো বছরের পুরনো কার্পেটের ধুলো
উন্মাদ নেচে উঠেছে বাঁশবাগান, ঘুটের দেয়াল
ভাঙা তক্তাপোষের পেরেক।
গম্বুজ থেকে গম্বুজে, রেলব্রীজ থেকে সাঁকোয় এবং ফ্লাইওভারে
রেডিও থেকে টিভিতে, ট্রাকটরে, ইঞ্জিনে গরুর গাড়ির কান্নায়
ভিটামিনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এইসব দৈববানী।

বৃক্ষের কালো চিমনিগুলো এখন উগরে চলেছে শোকবার্তা
বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে জলের উদ্দাম গীটার
জলের ভিতরের দৃশ্যবলীতে ঢুকে পড়েছে জন্ডিসের হাত।

দেখতে দেখতে যাদের বয়স ছিল আঠারো, এখন আটচল্লিশ,
পঞ্চদশীরা প্রৌঢ়া,
চামড়া ফেটে বল্কল, চোখে ছানি, হাঁটুতে ঘুণ।
উড়ন্ত পাখিরা হাওয়ার ভিতরে হিমের ফোঁটার মতো মুমূর্ষ!
আর ক্রমশ সূর্যাসে-র দিকে হেলে পড়ছে মহীয়ান সব ভাস্কর্য
বেঁকে যাচ্ছে পিতৃপুরুষের আজানুলম্বিত খিলান
ক্রমশ শঙ্খধ্বনির চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ঠিকানাহীন শিয়াল-কুকুরের

ডাক।

সমস্ত দৈববানীর গায়ে পিত্তি, পরগাছা এবং পোকামাকড়।

নিসর্গ

ছিঃ ছিঃ।
ছেঁড়া-খোঁড়া এক ফালি সবুজ রুমালের জন্যে আমাদের হা-পিত্যেশ,
আর তুই মাছরাঙা রঙের সাত-সাতটা পাহাড়
আর মিছিলের মতো লম্বা আঠারো মাইল শাল-মহুয়ার বন
আর গায়ে হলুদের কনের মতো একটা গোটা নদী আঁকড়িয়ে?
আবার নীল মেঘের খোঁপায় কি গুজেছিস ওটা?
সূর্যাসে-র লাল পালক?
চলতে-ফিরতে পায়ে বাজছে রুপোর মল
ভিতরে একশো গন্ডা পাখির স্বর।
আদরখাকী, বেশ আছিস তুই রাজবাড়ি বিছিয়ে।
তোর কাছে এলে সোনালী কুকুরের মতো লাফিয়ে ওঠে জন্মজন্মান্তর
মনে পড়ে যায় পুরনো শতাব্দীর সেই সব খেলাধুলো
যখন আমরাই ছিলাম দিগদিগন্তের রাজাধিরাজ
হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে আমাদের মুক্তাঞ্চল
আমরাই পদ্মপাতায় ওলোট-পালট হাওয়া
মেঘের ভিতরে আমাদের কাশবন, বাঁশবন, নাগরদোলা
জলের ভিতরে অফুরন্ত মৃগয়া
সন্ধের চাঁদকে আমরাই জাগিয়ে দিয়ে বলতাম, যা, বেড়িয়ে আয়।

এখন আমরা কলের গানের মতো এটেঁ গেছি কাঠের চৌকো বাক্সে
আমাদের ঘর আছে কিন্তু জানলা নেই

জানলা আছে কিন্তু নিসর্গ নেই।
শক্তিশালী করাতে প্রত্যহ আমাদের কাট-ছাঁট
কত্তার মার্জিমাফিক কখনো দৈত্য দানবের মতো লম্বা
কখনো ভিখিরির দুপয়সার মতো চ্যাপ্টা।

গরবিনী, হঠাৎ ছুটি-ছাটায় চলে এলে
তোর মায়াকাননের অন্তর্বাস খুলে দিবি তো ঘুমের আগে?

পোশাক-পরিচ্ছদ

নতুন জামা-জুতো পরলে পরিচয়হীন অন্যলোক হয়ে যাই আমি।
তখন নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, কেমন আছেন ? ভালো?
একবার বিদেশে গিয়েছিলাম অন্য লোকের ওভারকোট পরে
সকালসন্ধে সেই ওভারকোট পরা মানুষটাকে দেখে মনে হতো
মিলিটারি-কামড়ানো কোন রাজ্যের পলাতক রাষ্ট্রপতি।
এইসব দেখেশুনেই আমার ধারণা, মানুষের কোন ধরা-বাঁধা পোশাক
না থাকাই ভালো।
স্বাধীন চড়ুই-এর মতো যখন যে-রকম খুশী পোশাক-পরিচ্ছদে ঢুকে পড়ুক।
রমণীদের এত ভালো লাগে এ জন্যেই । প্রতিনি নতুন। আলাদা আলাদা।

যেদিন সবুজ শাড়ি, যেন ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে-পড়া লতানো জুই-এর ডাল
হাত ধরে ডেকে নিয়ে যাবে ঝাউবনের গোপন আঁধারে,
আগুনের উল্কি এঁকে দেবে হাতে, বুকে। দাঁতে চিবোতে দেবে লাল লবঙ্গ।
যেদিন লাল শাড়ি, কোমরের ঢাল থেকে উকি মারে তুর্কি ছোরার বাঁট।

কমলারঙের ছাপা শাড়ি যেদিন, বুঝতে পারি এই সেই চিতাবাঘ
মোলায়েম উরুর উপর শুইয়ে যে আমাকে চেটে-পুটে খাবে এখন ।
বেশ মজা পাই, নিজেকে নানান পোশাক-পরিচ্ছদে পুরে।
মাঝে মাঝে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করে তাগড়াই ঘোড়ার কেশরে,
মাঝে মাঝে টিয়া টুনটুনির পালকে।
একবার এক বিকলাঙ্গ জটায়ুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম
তার রক্তক্ষতময় ডানা,
একবার এক মৃত হরিণের কাছে তার ভ্রমনবিলাশী সোনালী ছাল।
বাঘের চেযে আমার অনেক ভালো লাগে জিরাফের ডোরা।
কিন্তু জিরাফের চেয়ে ভালো লাগে বাঘের সম্রাট-সুলভ চালচলন।
এক-একদিন খেলতে খেলতে হেরে গিয়ে শামুক-গুগলির মতো ছোট হয়ে যাই
তখন সর্বাঙ্গ কাতর হয়ে ওঠে শজারুর বর্শাফলকের জন্যে।
এক-একদিন কারখানা কিংবা কারখানার ম্যানেজারবাবু
বুকের বোতলে প্লাস্টিকের সরু স্ট্র ঢুকিয়ে লম্বা চুমুকে শুষে নেন
সমস্ত জল, জলস্তম্ভ, জোয়ার।
তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়, বন্ধগণ।
গণ্ডারের চামড়া এনে দিতে পারেন কেউ? অথবা বাইসনের সিং?

বজ্র শব্দটাকে

বজ্র শব্দটাকে আমরা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে ভুলে গেছি
আর বৃক্ষ শব্দটাকেও।
টাকা-পয়সা শব্দটার ভিতরে লুকনো আছে একটা ঝুমঝুমি
এবং উচ্চারণ করা খুব সহজ।

ঘরবাড়ি শব্দটা সোফায় হেলান দেওয়ার মতো আরামদায়ক
এবং উচ্চারণ করা খুব সহজ।
গাড়িঘোড়া শব্দটা যেন সমুদ্রতীরের হৈ হৈ হাওয়া
এবং উচ্চারণ করা খুব সহজ।
সাহিত্য সংস্কৃতি এইসব শব্দ বুট জুতোর মতো ভারি ছিল বলে
আমরা বানিয়ে নিয়েছি হালকা চপ্পল।
মুক্তি শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে
একবার আমাদের হাড়েমাসে ঢুকে পড়েছিল কনকনে শীত।
তাই সংগ্রাম শব্দের মতো তাকেও আমরা যৎপরোনাসি- এড়িয়ে চলি।
নানাবিধ ছোটলাট বড়লাটের পায়ে
কচুটাতার মতো অনবরত আছড়াতে আছড়াতে
বৃক্ষ শব্দটাকে আমরা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে ভুলে গেছি
আর বজ্র শব্দটাকেও।

বুকে লেবুপাতার বাগান

গত মাসের কাগজে আমাকে ঘোষণা করা হয়েছে
মৃত।
একাধিক ময়না তদন্তের রিপোর্ট ঘেটে ঘেটে
ওরা খুজেছে লেবুপাতার গন্ধ
আর রুপোলী ডট পেন।

যেহেতু লেবুপাতার গন্ধেই আমি প্রথম পেয়েছিলাম
পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার স্বাদ।

আর ঐ রুপোলী ডট্ পেন আমাকে শিখিয়েছিল
অক্ষর দিয়ে কিভাবে গড়তে হয় শাখা-প্রশাখাময় জীবন।

গত মাসের কাগজে মৃত ঘোষনার পরেও
ওরা কিন্তু তন্ন তন্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দামাল শালবন।
ওদের বুট জুতোয় থ্যেৎলে যাচ্ছে
সুর্যকিরণে জেগে ওঠা জল,
মানুষের মধ্যে যাতায়াতকারী সাঁকো।

আমি এখন উদয় এবং অস্তের মাঝামাঝি এক দিগন্তে।
হাতে রুপোলী ডট পেন
বুকে লেবুপাতার বাগান

মন কেমন করে

ভীষ্মদেবের জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করে
আবার যামিনী রায়ের জন্যেও।

সমস্ত বৃহৎ অট্টালিকার ভিতরে ঢুকে পড়েছে আগুনের শিকড়
সমস্ত প্রাচীন বইত্রে উইপোকার তছনছ সুড়ঙ্গ
সমস্ত সুফলা গাছের গায়ে কুড়োলের আঠারো ঘা আর রক্ত পুঁজ।

আমীর খাঁর জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করে
আবার জীবনানন্দের জন্যেও।

গান এবং ছবি যখন যে পথ দিয়ে মানুষের কাছে আসতে চায়
সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে কড়কড়ে মেঘ আর বাতাসের লম্ফ-ঝম্ফ।
আমাদের সামনে দৃশ্য বলতে এখন চুনকাম করা দেয়াল
আর শব্দ বলতে সেই সব উল্লাস, যা সারমর্মহীন।

ভাঙা মন্দিরের টেরাকোটার জন্যে মন কেমন করে
আবার সেনেট হলের সিড়ির জন্যেও।

সেই সব মহিমাময় নক্ষত্রেরা মরে গেছে
যারা জীবনের গায়ে জড়িয়ে দেয় ভয়ঙ্কর উচ্চাভিলাষ।
সেই সব ছলবলে নদীরাও শুকিয়ে গেছে মানচিত্রে
যাদের মুখস্থ ছিল মহাদেবের জটার ঠিকানা।
ক্রমশ কমে যাচ্ছে সেই সব মানুষ যারা মৃগনাভির মতো।

মাঝে মাঝে গান্ডীবের জন্যে মন কেমন করে
আবার একতারার জন্যেও।

মাছটি আমার চাই

তরল জলে সরলপুটি বেড়াচ্ছিল খেলে
লোকটা তাকে হঠাৎ দেখতে পেলে।
দেখতে পেয়েই চোখ হল তার কনে দেখার আলো
মনটা যেন হাত-বাড়ালো খিড়কি দুয়োর ঠেলে
মাছটি আমার চাই।

বেনারসীর শাড়ি চাইলে বেনারসীর শাড়ি
সাতমহলা বাড়ি চাইলে সাতমহলা বাড়ি
আলতা, সিদুর আতর, সাবান লংলেইং এ গান
জর্দমাখা পান চাইলে জর্দামাখা পান
মাছটি আমার চাই।

হৃদয় জুড়ে শতেক ফুটো খড় কুটোতে ঢাকা
জীবন যেন গন্ডে পড়া গুরুর গাড়ির চাকা।
তরল জলে সরল পুটি মনমোহিনী আঁশ
এক ঝিলিকেই কী সুখ দিলো, সুখ যেন সন্ত্রাস।
ওকে পেলেই শোক পালাবে
শোক পালালে স্বর্গ পাবো, চন্দ্রালোকে ঠাঁই
মাছটি আমার চাই
শোনো, মাছটি আমার চাই।

রাত গাঢ় হলেই

রাত গাঢ় হলেই আমি নিজেকে ছিঁড়ে নিতে পারি
পৃথিবীর রক্তাক্ত নাড়ির খামচা থেকে।
রাত গাঢ় হলেই বুঝতে পারি সমস্ত শব্দের ঠিক ঠিক মানে,
সমস্ত ঘটনার ছাল ছাড়িয়ে পৌঁছতে পারি তার হৃৎপিন্ডে।

যত রকম জিজ্ঞাসা আছে তার সব কিছুকে জুড়লে একটা মানুষ।
মানুষের জিজ্ঞাসা মানুষকে টেনে নিয়ে যায়।
মাটির থেকে উপরে, খানাখন্দ সাঁকো সুড়াঙ্গের উপরে
ফিনফিনে শান্তি, এমনকি ধপধপে কাচা নিরাপত্তার উপরে
এমন সৌরলোকে, যেখানে আলোর বর্শা থাক থাক করে সাজানো।

রাত গাঢ় হলেই নক্ষত্রগুলো উজ্জল হয়ে ওঠে
তপঃ ক্লিষ্ট ঋষিদের মতো,
এবং তাঁরা নেমে আসেন পৃথিবীর খরখরে অন্ধকারের অলিতে গলিতে।
আর সেই সুযোগে আমার দেখা হয়ে যায়।
প্রত্যেকটি স্তম্ভের ভিতরকার ফাটল
প্রত্যেকটি হিতৈষী পুরুষের ছোরার মতো চোরা হাসি
প্রত্যেকটি ঘড়ির কাঁটায় বিস্ফোরনের গোপন নির্দেশ।

রাত গাঢ় হলেই নিজের পৃথিবীকে কাছে পাই আমি।
হাজার মাইল ফলন্ত শশ্যের ক্ষেত হয়ে যায় আমার ভাবনাগুলো।
আর উন্মাদ পুরুষ যেভাবে নারীকে ভালোবাসে নিংড়ে নিংড়ে
সেই ভাবে সময়ের সঙ্গে আমার
তুমুল ভালোবাসাবাসির সংঘর্ষ।

সেই গল্পটা

আমার সেই গল্পটা এখনো শেষ হয়নি।
শোনো।

পাহাড়টা, আগেই বলেছি
ভালোবেসেছিল মেঘকে
আর মেঘ কী ভাবে শুকনো খটখটে পাহাড়টাকে
বানিয়ে তুলেছিল ছাব্বিশ বছরের ছোকরা
সে তো আগেই শুনেছো।

সেদিন ছিল পাহাড়টার জন্মদিন।
পাহাড় মেঘেকে বললে
আজ তুমি লাল শাড়ি পরে আসবে।
মেঘ পাহাড়কে বললে
আজ তোমাকে স্নান করিয়ে দেবো চন্দন জলে।

ভালোবাসলে নারীরা হয়ে যায় নরম নদী
পুরুষেরা জ্বলন্ত কাঠ।
সেইভাবেই মেঘ ছিল পাহাড়ের আলিঙ্গনেরআগুনে
পাহাড় ছিল মেঘের ঢেউ-জলে।
হঠাৎ,
আকাশ জুড়ে বেজে উঠল ঝড়ের জগঝম্প
ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে ছিনতাইয়ের ভঙ্গিতে ছুটে এল
এক ঝাঁক হাওয়া
মেঘের আঁচলে টান মেরে বললে
ওঠ্ ছুড়ি! তোর বিয়ে।

এখনো শেষ হয়নি গল্পটা।
বজ্রের সঙ্গে মেঘের বিয়েটা হয়ে গেল ঠিকই
কিন্তু পাহাড়কে সে কোনোদিনই ভুলতে পারল না।
বিশ্বাস না হয় তো চিরে দেখতো পারো
পাহাড়টার হাড় পাঁজর,
ভিতরে থৈ থৈ করছে
শত ঝর্ণার জল।

রাত গাঢ় হলেই

রাত গাঢ় হলেই আমি নিজেকে ছিঁড়ে নিতে পারি
পৃথিবীর রক্তাক্ত নাড়ির খামচা থেকে।
রাত গাঢ় হলেই বুঝতে পারি সমস্ত শব্দের ঠিক ঠিক মানে,
সমস্ত ঘটনার ছাল ছাড়িয়ে পৌঁছতে পারি তার হৃৎপিন্ডে।

যত রকম জিজ্ঞাসা আছে তার সব কিছুকে জুড়লে একটা মানুষ।
মানুষের জিজ্ঞাসা মানুষকে টেনে নিয়ে যায়।
মাটির থেকে উপরে, খানাখন্দ সাঁকো সুড়াঙ্গের উপরে
ফিনফিনে শান্তি, এমনকি ধপধপে কাচা নিরাপত্তার উপরে
এমন সৌরলোকে, যেখানে আলোর বর্শা থাক থাক করে সাজানো।

রাত গাঢ় হলেই নক্ষত্রগুলো উজ্জল হয়ে ওঠে
তপঃ ক্লিষ্ট ঋষিদের মতো,
এবং তাঁরা নেমে আসেন পৃথিবীর খরখরে অন্ধকারের অলিতে গলিতে।

আর সেই সুযোগে আমার দেখা হয়ে যায়।
প্রত্যেকটি স্তম্ভের ভিতরকার ফাটল
প্রত্যেকটি হিতৈষী পুরুষের ছোরার মতো চোরা হাসি
প্রত্যেকটি ঘড়ির কাঁটায় বিস্ফোরনের গোপন নির্দেশ।

রাত গাঢ় হলেই নিজের পৃথিবীকে কাছে পাই আমি।
হাজার মাইল ফলন্ত শস্যের ক্ষেত হয়ে যায় আমার ভাবনাগুলো।
আর উন্মাদ পুরুষ যেভাবে নারীকে ভালোবাসে নিংড়ে নিংড়ে
সেই ভাবে সময়ের সঙ্গে আমার
তুমুল ভালোবাসাবাসির সংঘর্ষ।

সেই গল্পটা

আমার সেই গল্পটা এখনো শেষ হয়নি।
শোনো।
পাহাড়টা, আগেই বলেছি
ভালোবেসেছিল মেঘকে
আর মেঘ কী ভাবে শুকনো খটখটে পাহাড়টাকে
বানিয়ে তুলেছিল ছাব্বিশ বছরের ছোকরা
সে তো আগেই শুনেছো।

সেদিন ছিল পাহাড়টার জন্মদিন।
পাহাড় মেঘেকে বললে

আজ তুমি লাল শাড়ি পরে আসবে।
মেঘ পাহাড়কে বললে
আজ তোমাকে স্নান করিয়ে দেবো চন্দন জলে।

ভালোবাসলে নারীরা হয়ে যায় নরম নদী
পুরুষেরা জ্বলন্ত কাঠ।
সেইভাবেই মেঘ ছিল পাহাড়ের আলিঙ্গনেরআগুনে
পাহাড় ছিল মেঘের ঢেউ-জলে।
হঠাৎ,
আকাশ জুড়ে বেজে উঠল ঝড়ের জগঝম্প
ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে ছিনতাইয়ের ভঙ্গিতে ছুটে এল
এক ঝাঁক হাওয়া
মেঘের আঁচলে টান মেরে বললে
ওঠ্ ছুড়ি! তোর বিয়ে।

এখনো শেষ হয়নি গল্পটা।
বজ্রের সঙ্গে মেঘের বিয়েটা হয়ে গেল ঠিকই
কিন্তু পাহাড়কে সে কোনোদিনই ভুলতে পারল না।
বিশ্বাস না হয় তো চিরে দেখতো পারো
পাহাড়টার হাড় পাঁজর,
ভিতরে থৈ থৈ করছে
শত ঝর্ণার জল।